ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক গণ্যমান্য মহাপুরুষদের জন্ম হয়েছিল, সেইসকল মহাপুরুষদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম | বাংলাদেশের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য |

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন | তাঁর বাবার নাম ছিল ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম ছিল ভগবতী দেবী |

ঈশ্বরচন্দ্রের মা ভগবতী দেবী এক অসামান্য মহিলা ছিলেন, সেই সময়কার কু-সংস্কারছন্ন পরিবেশে থেকেও তিনি ছিলেন আধুনিক চিন্তার অধিকারিনী |

পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো না হওয়ায় অতি অল্প বয়সেই ঈশ্বরের বাবা অর্থাৎ ঠাকুরদাসকে অর্থ উপার্জনের জন্য কোলকাতায় যেতে হয় | সেখানে এসে এক ব্যবসায়ীর খাতা লেখার কাজে নিযুক্ত হন তিনি খুবই অল্প পয়সার বিনিময় |

এরপর ধীরে ধীরে তিনি তাঁর কাজের প্রতি ন্যায়-নিষ্ঠা, সততার দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন | পরবর্তী সময়ে বাবার সেই অসামান্য গুন ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও পূর্ণ বিকাশ পায় |

প্রচুর দারিদ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করলেও তাঁর মনোভাব ছিল একদম দৃঢ় |

ছাত্রবস্থায় তিনি কোনদিনও পড়াশোনায় অমনোযোগী হননি, তাইতো তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র | তিনি কতটা মেধাবী ছিলেন তার প্রমান হয়তো আমরা আমাদের স্কুলের পড়ার বইতেই পেয়েছি, ঈশ্বরচন্দ্রের একটি গল্পে |

আশা করি, তোমরা অনেকেই এতক্ষণে বুঝে গেছো আমি কোন গল্পের কথা এখানে বলছি |

আর যারা এখনো বোঝনি, তাদেরকে আমি গল্পটা একটু ছোট্ট করে বলেদি চলো:

একবার ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বাবার সাথে কলকাতায় যাচ্ছিলেন | সেখানে পথের ধারে কিছুদুর অন্তর অন্তর মাইলস্টোন পোঁতা ছিল |

বিদ্যাসাগর তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, পথের ধারে শীলের মত দেখতে ওই জিনিসটা কী?

তখন তাঁর বাবা তাঁকে বোঝান যে এটিকে বলে “মাইলস্টোন” এবং এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, সেখান থেকে কলকাতার দূরত্ব আর কতটা এবং এরমধ্যে লেখা ইংরাজি সংখ্যাগুলোই সেখানকার দূরত্ব নির্ণয় করছে |

এরপর বিদ্যাসাগর সেই মাইলস্টোনে লেখা ইংরাজি সংখ্যা গুনতে গুনতে পথ চলতে থাকেন আর অতি দ্রুত শিখে ফেলেন ইংরাজি গণনা |

ঈশ্বরচন্দ্র এরপর তাঁর বাবার সাথে কলকাতা সংলগ্ন বড়বাজারে অবস্থিত ভাগবত সিংহের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন এবং শিবচরণ মল্লিকের তত্বাবধানে তাঁরই পাঠশালায় একবছর পড়াশোনা করেন |

১৮২৯ সালের ১লা জুন তিনি কলকাতার একটি সরকারী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে পড়াশোনায় দারুন ফল করে নিজের মেধাবী গুনের পরিচয় দেন সবাইকে | এরফলে তিনি সেই কলেজ থেকে প্রতিমাসে ৫ টাকা করে বৃত্তিও পান |

শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের একজন বিশেষ ছাত্র ছিলেন বিদ্যাসাগর | তাঁর কাছে পড়েই তিনি সংস্কৃত কলেজে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন |

এরপর বিদ্যাসাগর সেই কলেজ থেকেই সংস্কৃত বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করার পর একে একে ব্যাকরণ,বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়,জ্যোতিষ শাস্ত্র, কাব্য এবং অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আবার পড়াশোনা শুরু করেন এবং একসময় সেইসব বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনও করেন |

মাত্র ১৫ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৩৫ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন দিনময়ী দেবীর সাথে |

সেই সময় খুব অল্প বয়সেই সবাইকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত, আশা করি তোমরা সেটা সবাই জানো | বর্তমানে যেমন ছেলেদের ২১ এবং মেয়েদের ১৮ বছরের হওয়া বাধ্যতামূলক বিয়ে করার জন্যে, সেইসময় কিন্তু তেমন কোনই নিয়ম ছিলোনা |

এরপর আসি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন সম্পর্কে, তিনি মাত্র ২১ বছর বয়সেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন | সেই সময় তাঁর বেতন ছিল মাত্র ৫০ টাকা |

তিনি সেখানে ১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ সালের ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত পড়ান এবং পরে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন |

পরের বছর মানে ১৮৪৭ সালে তিনি একটি বইয়ের দোকান স্থাপন করেন যেটার নাম দেওয়া হয় সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি |

সেই বছরেই তিনি প্রকাশ করেন হিন্দি “বেতাল পচ্চিসী” অবলম্বনে রচিত বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থটিকে | এটিই ছিল তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ উপন্যাস |

সংস্কৃত কলেজের সেইসময় সেক্রেটারি ছিলেন রসময় দত্ত যার সাথে ঈশ্বরচন্দ্রের মতপার্থক্য দেখা দেয় একসময়, সেই জন্য তিনি ১৮৪৭ সালের ১৬ জুলাই সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের পদ থেকে অবশেষে পদত্যাগ করেন |

১৮৪৯ সালে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর লেখা জীবনচরিত নামক গ্রন্থখানি এবং তারপর প্রকাশ করেন ১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে বোধদয় বইটিকে |

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃ ভক্তি ছিল অসামান্য | সেটা তোমরা এই ঘটনা সম্বন্ধে পড়েই আশা করি বুঝতে পারবে:

জানা যায়, ছোট ভাইয়ের বিয়ের জন্য মা ভগবতী দেবী বিদ্যাসাগরকে একটা চিঠি পাঠায় বাড়িতে আসার জন্য | মায়ের আদেশ পেয়ে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের কাছে ছুটি চাইতে যান বাড়ী যাবার জন্য কিন্তু মার্শাল সাহেব ছুটি দিতে না চাইলে তিনি চাকুরী ছেড়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাকে এটাও বলেন যে, মায়ের আদেশ অমান্য করা তাঁর কাছে একদম অসম্ভব |

অবশেষে ছুটি পাওয়ার পর তিনি রাত্রেই বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় নদী পারাপারের জন্য কোনো নৌকা পাওয়া তখন যাচ্ছিল না | তখন তিনি আর কোনো উপায় না পেয়ে, সেই প্রকান্ড দামোদর নদী সাঁতরিয়েই বাড়িতে এসে পৌছান |

১৮৫৬ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য নিযুক্ত হন বিদ্যাসাগর এবং ১৮৫৯ সালে তিনি “ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল” স্থাপনে বিশেষ ভুমিকা পালন করেন কিন্তু পরে ১৮৬৪ সালে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের নাম বদল করে রাখা হয় “হিন্দু মেট্রেপলিটন ইসস্টিটিউট”।

ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেখানকার সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলেন | ১৮৭৯ সালে এটিকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা হয় | বর্তমানে আজ হিন্দু মেট্রেপলিটন ইসস্টিটিউট “বিদ্যাসাগর কলেজ” নামেও পরিচিত |

এরপর তিনি অবশেষে সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিবেশ করেন তাঁর নিজের বন্ধুদের সহযোগীতায় | ১৮৫০ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সাথে মিলে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন যার নাম ছিল সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা | সেটার প্রথম সংখ্যায় “বাল্য বিবাহের দোষ” নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করা হয় |

নিজের জন্মভূমি মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি অবৈতনিক স্কুল | এছাড়া নারী শিক্ষার প্রসারও তিনি করেন |

বিধবা বিবাহের মত সুন্দর একটি প্রথার প্রচলনও তিনি করেন সমাজের চিরাচরিত রীতি-নীতি ভেঙে | এরফলে তাঁকে অনেক অপমান, বিদ্রুপও সহ্য করতে হয় সাধারণ মানুষদের থেকে |

কিন্তু তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র কোনো দুঃখ ছিলোনা বরং দৃঢ় মনোবলের দ্বারা তিনি নিজের কাজ আরো ভালোভাবে করে চলেন |

ছোটদের শিক্ষার জন্য তিনি লিখে গেছিলেন বর্ণপরিচয়, কথামালা, ঈশপের গল্পের মত কিছু অনবদ্য বই যা আজও বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ বই হিসাবে পরিচিত |

তোমরা কি জানো, ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি যেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির অন্যতম সদস্য হিসাবে মনোনীত হন বিদ্যাসাগর মহাশয়।

আর এই সমিতির ৩৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ছয় জন ছিলেন ভারতীয় যার মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন |

সেই বছর তিনি নারীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে হুগলি জেলায় সাতটি ও বর্ধমান জেলায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন বছরের শেষ দিকে |

পুরো এক বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সারা দক্ষিণবঙ্গে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনও করে ফেলেন | ১৮৫৮ সালের ৩রা নভেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন কারণ সেখানকার শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয় ।

৩৯ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর মহাশয় সরকারের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন পুরোপুরি ভাবে। নিজের কাজের জন্য তিনি কোনদিনও সরকারের তরফ থেকে কোনও রকমের স্বীকৃতি বা আর্থিক সহায়তা পাননি।

শেষ জীবনে এসে তিনি কলকাতার বাদুড়বাগানে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন এবং ১৮৭৭ সালের জানুয়ারি থেকে তিনি সেখানেই বাস করতে থাকেন | এরপর ১৮৮০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক তাঁকে সি.আই.ই উপাধিতে ভূষিত করা হয়

তোমরা হয়তো অনেকেই জানোনা যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস ১৮৮২ সালের ৫ আগস্ট বাদুড়বাগানের সেই বাড়িতে বিদ্যাসাগরের সাথে দেখা করতে যান এবং সেখানে তাঁরা একে অপরের সাথে আলাপ করেন এবং কথাবার্তাও বলেন |

অবশেষে ১৮৯১ সালে ২৯শে জুলাই বাংলার নবজাগরণের অন্যতম এই পথিকৃত রাত্রি ২:১৮মিনিটে তাঁর কোলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন |

ঈশ্বরচন্দ্রের তখন বয়স হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৭১ বছরের কাছাকাছি | ডাক্তারের মতে, তিনি লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন অনেকদিন ধরেই |

নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন যিনি কিনা ঈশ্বরচন্দ্রের ছেলে ছিলেন, তিনি তাঁর বাবার মৃত্যুর পর ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর বাবার অসমাপ্ত আত্মজীবনী “বিদ্যাসাগর চরিত” প্রকাশ করেন |

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আজ প্রত্যেক বাঙালির গর্ব | তিনি সেইসময় যা কিছু কাজ করে গেছেন তা একেবারেই অসামান্য এবং দুর্দান্ত | তাঁর কাছে সমগ্র বাঙালী সমাজ আজ ঋণী | তাঁর এই ঋণ শোধ করা আমাদের কাছে একদম অসম্ভব |

সেইসময় বাংলা তথা সারা ভারতে জাত-পাত নিয়ে বেশিরভাগ মানুষই ভীষণ **Serious** ছিল | আর মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে বেশিরভাগ পরিবারই রাজি ছিল না |

তো, সেইরকম একটা ভয়ংকর পরিস্থিতিতে একটা মানুষের কতটা সাহসী এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মনোভাবের প্রয়োজন, সেটা আশা করি আর তোমাদের বোঝাতে হবেনা | তোমরা নিজেরাই হয়তো কল্পনা করতে পারছো |

তাহলে এত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও যদি একটা মানুষ নিজের সব লক্ষ্যকে পূরণ করতে পারে তাহলে আমরা কেন পারবোনা?

আমরাও নিশ্চই পারবো |

শুধু মনোভাবকে দৃঢ় করতে হবে আমাদের, মনোভাব দৃঢ় হলে এবং লক্ষ্য একদম পরিষ্কার থাকলে সাহস তখন অনায়াসেই চলে আসবে ভিতরে |

তখন আমাদের কাছে বড় থেকে বড় সমস্যাও ছোট বলে মনে হবে এবং আমরাও বিনা দুশ্চিন্তায় নিজেদের কাজের মাধ্যমে লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারবো |

বিদ্যাসাগরের জীবনী আমাদের কাছে শুধু জীবনী নয়, এটা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ শিক্ষার সমান | তিনি আমাদের এটা শিখিয়েছেন যে, মানুষের উপকার কীভাবে করতে হয়, সমাজের বিপন্ন মানুষদের পাশে কীভাবে দাঁড়াতে হয় |

শিখিয়েছেন আসল মাতৃভক্তি ও এটা প্রমান করে দেখিয়েছেন আমাদের সবাইকে যে, কিভাবে একজন চাইলেই যেকোনো স্থান-কাল-অবস্থায় কোনো কিছু শিখতে পারে | সে রাস্তায় চলতে চলতেই হোক না কেন |